জীবনে যা দেখলাম

সপ্তম খণ্ড (১৯৯৩-১৯৯৪)

[৯ খণ্ডে সমাপ্ত]

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন - ঢাকা

সূচিপত্র

দেখা-সাক্ষাতের পালা	১৭
দুটো বিশেষ ফোন	১৭
সাংগঠনিক সফর	১৭
মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন উদ্বোধন	১৭
সাংগঠনিক সফরের সিদ্ধান্ত	১৮
মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশনে সমাপনী ভাষণ	২০
নাগরিকত্ব মামলার প্রধান উকিল	২১
কেয়ারটেকার সরকার ফর্মুলায় অনুষ্ঠিত নির্বাচন	২৩
কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি	২৩
কেয়ারটেকার সরকার ইস্যু প্রধান রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত	২৪
প্যালেস্টাইনের হেবরন ইস্যু সংসদে	২৪
বড় রাজনৈতিক ইস্যু সৃষ্টি	২৫
শুরু হলো বয়কটের পালা	২৬
কেয়ারটেকার সরকার ইস্যু জামায়াতেরই সৃষ্টি	২৬
জামায়াতে ইসলামীর মহাসংকট	২৭
এ মহাসংকট থেকে উত্তরণের প্রয়াস	২৭
প্রধানমন্ত্রীর সাথে মাওলানা নিজামীর একান্ত সাক্ষাৎ	২৮
বেগম জিয়ার জবাব	২৯
হাইকোর্টে নাগরিকত্ব মামলার শুনানি ও রায়	৩০
সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ	৩০
আপিল বিভাগে শুনানি	৩১
এটর্নি জেনারেলের যুক্তির মর্মকথা	৩১
এটর্নি জেনারেলের যুক্তির জবাবে ব্যারিস্টার ইউসুফ	৩২
ঐতিহাসিক রায়	৩৩
এ রায়ের সুফল	৩৪
রায়ের সুখবর বয়ে এনেছেন মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম	৩৫
মুবারকবাদের পালা	৩৫
নাগরিকত্ব পুনর্বহাল আন্দোলনে যাঁরা শহীদ হলেন	৩৬
নাগরিকত্ব বহালের দাবিতে আন্দোলনের গুরুত্ব	৩৬

নেভিগেটর সিস্টেম	২০৪
বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতি	২০৫
পাশ্চাত্যের সাথে মুসলিমদের বিরোধ	২০৫
আমেরিকার ইসলামফোবিয়া	২০৬
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে আমেরিকার বর্তমান পলিসি	২০৮
ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে নতুন কৌশল	২০৮
ইসলাম নিজস্ব শক্তিতেই এগুচ্ছে	২০৯
দেশে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে	২০৯
ঢাকায় রওয়ানা	২১০
ম্যানচেস্টার বিমানবন্দরে	২১১
বিমানে ৭ ঘণ্টা	২১১
দোহা বিমানবন্দরে	২১২
ঢাকার পথে	২১২
ঢাকা বিমানবন্দরে	২১৩
তাফহীমুল কুরআন থেকে সংগৃহীত বিষয়ে লেখা বই	২১২
আরেকটি নতুন বই	২১৬
আমার পিতৃতুল্য শ্বশুর সাহেবের ইন্তিকাল	২১৮
আমার পিতৃতুল্য মুরব্বি	২১৮
ইসলামী আন্দোলনের প্রতি তাঁর আগ্রহ	২১৮
কুরআনের প্রেমিক	২১৯
একজন স্বকৃত (ঝবষভসধফব) সফল ব্যক্তিত্ব	২২০
শ্বশুর সাহেবের সন্তানগণ	২২১
আমার ভাই-বোনদের সন্তানাদি	২২২
আমরা ৪ ভাই ও ৫ বোন ছিলাম	২২৩
আমার চাচাদের কথা	২২৫
ছোট চাচার কথা	২২৬
ছোট চাচার সন্তানাদি	২২৬
আমাদের পূর্বপুরুষ	২২৭
শেখ হাসিনার হিংস্র রাজনীতি	২২৭
২০০১ সালের নির্বাচনের পর শেখ হাসিনার আজব রাজনীতি	২২৯
বিদেশে শেখ হাসিনার দেশবিরোধী অপপ্রচার	২৩১
হতাশ-হাসিনার ভারত সফর	২৩১

২৬১.

দেখা-সাক্ষাতের পালা

ষোল মাস কারাগারের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর নিতান্তই স্বাভাবিক কারণে আত্মীয়-স্বজন ও ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত সর্বস্তরের মানুষ আমার সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে আসতে থাকেন। মুক্তি পাওয়ার জন্য মুবারকবাদ জানানো, জেলজীবন সম্পর্কে জানা ইত্যাদিই সাক্ষাতের সময় আলোচ্য বিষয় ছিল।

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে সরকার হাইকোর্ট থেকে আমার পক্ষে প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছিল। ঐ আপিলের রায়ের অপেক্ষায় আমাকে ধৈর্যধারণ করতে হচ্ছিল বিধায় আমার কর্মতৎপরতা ঐ পর্যন্ত সাংগঠনিক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ রাখা যথাযথ মনে করেছিলাম।

তাই সাংবাদিকগণ সাক্ষাৎ করতে এলে আমি সীমিত বিষয়েই কথা বলতাম। কারণ, আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল সরকার কর্তৃক আমার নাগরিকত্ব স্বীকার না করা। হাইকোর্ট আমাকে বাংলাদেশের নাগরিক ঘোষণা দিয়ে আমার নাগরিকত্ব বাতিলের সরকারি আদেশকে অবৈধ ঘোষণা করেছিলেন; কিন্তু হাইকোর্টের এ রায় বাতিল করার উদ্দেশ্যে সরকার সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল করায় বিষয়টা অমীমাংসিতই থেকে গিয়েছিল। আমার সমস্যা রয়েই গেল।

দুটো বিশেষ ফোন

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁদের সাথে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক, তাঁদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করে কুশল বিনিময় করতে থাকলাম। অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী ফোনে খবরাখবর নিয়েছেন। এটা তেমন উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। তবে এমন দুজনকে আমি ফোন করেছিলাম, যাঁরা আমার ফোন পেয়ে রীতিমতো অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। তাই আমি ঐ দুটো বিশেষ ফোনের বিষয়কে উল্লেখযোগ্য মনে করি। তাঁদের একজন হলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী, যাঁর নির্দেশে আমাকে প্রথমে শো-কজ ও পরে গ্রেফতার করা হয়। অপরজন হলেন আওয়ামী লীগনেতা আবদুস সামাদ আজাদ, যিনি তথাকথিত গণ-আদালতে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবদুল মতিন চৌধুরী সাহেবের বাড়ি থেকে আমার বাড়িতে হেঁটে আসতে মাত্র সাত-আট মিনিট সময় লাগে এবং প্রতি ঈদুল ফিতরে তিনি ঈদের দিন হেঁটে এসেই ঈদ মুবারক জানাতেন। একসময় ব্যক্তিগত পর্যায়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্কই আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠে। মন্ত্রী হওয়ার পরও ফোনে যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আমার সাথে যে আচরণ তিনি করেছেন, এর জন্য আমি তাঁকে দায়ী মনে করি না। তিনি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ পালন করেছিলেন, আর প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ পালন করা তাঁর কর্তব্য হিসেবেই গণ্য।

তাঁর সাথে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সুবাদে ফোন করে তাঁকে অত্যন্ত বিব্রতকর অবস্থায় পেয়েছিলাম। কাঁচুমাচু হয়ে তিনি বললেন, 'ভাই! আমাকে এ দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে বলে আমি দুঃখিত।' আমি বললাম, 'আমি জেলখানায় আপনার মেহমান হিসেবে ভালোই ছিলাম। আপনাকে রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। আপনার সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আমি বহাল রাখব।'

এরপর শেখ হাসিনার শাসনামলে তিনি আমাদের মহল্লায় ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। তাঁর বাড়ি ডেভেলপারকে সুউচ্চ বিল্ডিং করতে দিয়ে সাময়িকভাবে এ মহল্লায় থাকায় তাঁর সাথে আমার বন্ধুত্ব আরো গভীর হয়। মহল্লার মসজিদে জামায়াতে নামায পড়তে এলে নিয়মিত তাঁর সাথে দেখা হতো। আমার বাড়িতে বেশ কয়েকবার দেশের রাজনীতি নিয়ে তাঁর সাথে মতবিনিময় হয়েছে।

পূর্বে উল্লেখ করেছি, পাকিস্তান আমল থেকেই জনাব আবদুস সামাদের (তখন 'আজাদ' শব্দ নামের অংশ ছিল না) সাথে রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সূত্র ধরে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তাই ১৯৭৮ সালে আমি দেশে ফিরে আসার পর তিনি গোপনে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। বহুবার রাষ্ট্রদূতদের আয়োজিত অনুষ্ঠানে দেখা হয়ে গেলে তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গন হতো।

১৯৯১-এর নির্বাচনের পর জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠনে বিএনপিকে সমর্থন দিলে আওয়ামী ও বামপন্থি মহল আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার জোরদার করে। তখন লক্ষ করলাম, হোটেল সোনারগাঁওয়ে এক অনুষ্ঠানে আমার সাথে হাত না মিলিয়ে এই কথা বলে তিনি পিছিয়ে গেলেন যে, 'পত্রিকায় ছবি এসে যাবে'। এরপর থেকে আমি অনেক অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখেও কাছে যাইনি।

তথাকথিত গণ-আদালতে তিনি যে জঘন্য ভূমিকা পালন করেছেন তা জানা সত্ত্বেও তাঁকে ফোন করে বললাম, 'আস্সালামু আলাইকুম! আপনার বিস্মৃত বন্ধু গোলাম আযম বলছি।' তিনি এতটা বিব্রতবোধ করলেন যে, কথাই বলতে পারছিলেন না। একটু সামলিয়ে নিয়ে সিলেটি ভাষায় বললেন, 'কেমন আছেন? শরীলডা বালানি?' আমি তাঁকে বেশিক্ষণ বিব্রত না করে এ কথা বলেই ফোন রেখে দিলাম যে, 'দলীয় নির্দেশে আমার বিরুদ্ধে যে ভূমিকা পালন করেছেন তাতে আমি মাইন্ড করিনি।'

১৯৯৪ থেকে '৯৬ পর্যন্ত কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে একসাথে আন্দোলন করেছে। সামাদ সাহেবের বাসায়ই জামায়াত ও জাতীয় পার্টির লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠক হতো। সংসদ বয়কট করা হলেও সংসদ ভবনে তিন দলের এমপিদের বৈঠকাদি হতো। কিন্তু তিনি আমার সাথে আর কোনো যোগাযোগ করেননি। হয়ত তাঁর সে মুখও ছিল না।

সাংগঠনিক সফর

১৯৯৩ সালের ১৫ জুলাই জেল থেকে মুক্তি পেলেও আমার নাগরিকত্ব পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত আমীরে জামায়াত হিসেবে প্রকাশ্যে কোনো তৎপরতা শুরু করা গেল না।

বিদেশি নাগরিক আমীরে জামায়াত হওয়ার অভিযোগেই তো এত হৈ চৈ হয়ে গেল। তাই সুপ্রিম কোর্টে নাগরিকত্ব মামলার চূড়ান্ত রায় না হওয়া পর্যন্ত সাংগঠনিক সফরও করা হচ্ছিল না। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে মামলার শুনানি যে কবে হবে, তা অনিশ্চিত। চার মাস পার হয়ে নভেম্বর মাসেও শুনানির কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, ৭ ডিসেম্বর থেকে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন শুরু হলে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে। জনসভা না করলেও জামায়াতের সাংগঠনিক কর্মসূচি উপলক্ষে বিভিন্ন জেলায় সফর করা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মজলিসে শূরার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকতে হলো।

মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন উদ্বোধন

৭ ডিসেম্বর (১৯৯৩) তিন দিনব্যাপী মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন শুরু হলো। উদ্বোধনী দিনে আমার বক্তব্য কার্যবিবরণীতে সংরক্ষিত রেজিস্টার থেকে উদ্ধৃত করছি:

"আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম এক সংক্ষিপ্ত ভাষণের মাধ্যমে মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে আমীরে জামায়াত আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ) ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর আন্দোলনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, 'সকল নবী-রাসূল একই উদ্দেশ্যে কাজ করেছেন, আর তা হলো– (১) সৎ লোক তৈরি এবং (২) তাঁদের দ্বারা আল্লাহর দীন কায়েম করা।' নবী-রাসূলদের আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাঁরা সকলেই পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক বিধি-বিধান মেনে চলেছেন এবং আল্লাহর আইন তখনই কায়েম হয়েছে, যখন জনগণ সাড়া দিয়েছে। শক্তির জোরে সন্ত্রাসের মাধ্যমে জনগণের উপর কোনো আইন চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের মূল শিক্ষা যে, জনগণের মর্জির বিরুদ্ধে তাদের উপর কোনো শাসক বা আইন চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।"

এদিক থেকে আধুনিক গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের কোনো বিরোধ নেই বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তবে তিনি বলেন, 'সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আধুনিক গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের বিরোধ রয়েছে। কারণ, ইসলামে সকল লোকে চাইলেও আল্লাহর আইন বদলানো যায় না।'

আমীরে জামায়াত দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে ইসলামই হচ্ছে গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক। ইসলাম মানুষের মন দখল করতে চায়; ইসলাম সর্বদাই আইনের শাসন কায়েম করতে চায়, যা গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।'

গণতান্ত্রিক আন্দোলনসমূহে জামায়াতের বলিষ্ঠ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে আমীরে জামায়াত বলেন, 'জামায়াত আন্তরিকভাবে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতি গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল।' এ প্রসঙ্গে তিনি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস, ১৯৯১ সালে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে অবাধ-নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'আশা ছিল এরপর বিনা বাধায় গণতন্ত্র বিকশিত হবে, গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেবে; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, জনগণের সে আশা এখনো পূরণ হয়নি।'

মুহতারাম আমীরে জামায়াত বলেন, 'গণতন্ত্রের অন্যতম দাবি হলো–
ক. রাজনৈতিক দলসমূহের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র বর্তমান থাকা এবং
খ. রাজনৈতিক আচার-আচরণে সুস্থতা ও সহনশীলতা অনুসরণ করা।

কিন্তু এ দেশের রাজনীতিতে এসব গুণের অভাব তীব্রভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে।'

আমীরে জামায়াত দেশ ও গণতন্ত্রের স্বার্থে ক্ষমতাসীন বিএনপি, প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং অন্যসব দলের প্রতি নিম্নলিখিত আচার-আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্য আকুল আবেদন জানান–

১. অপরের আহূত সভা-সম্মেলনে বাধা দান ও হামলা করা,
২. অপরের আহূত সভাস্থলে অন্যায়ভাবে সভা ডাকা এবং সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করে সন্ত্রাসী আচরণকে সহায়তা দান করা,
৩. কোনো রাজনৈতিক দলকে বেআইনি ঘোষণার দাবি করা এবং
৪. জাতীয় সংসদে পর্যন্ত অন্যকে কথা বলার সুযোগ না দেওয়া, কথা বলতে বাধা দেওয়া এবং অরুচিকর কার্যকলাপ ও কথাবার্তা বলা।

মুহতারাম আমীরে জামায়াত জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরকে ইসলাম ও গণতন্ত্রের স্বার্থে আরো ধৈর্যধারণ করার জন্য আহ্বান জানান। এ প্রসঙ্গে বিগত সময়ে এমনকি আমীরে জামায়াতকে গ্রেফতার করার পরও গাড়ি ভাঙচুর না করা এবং কোনো প্রকার ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত না হয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন পরিচালনা করার তাওফীক দানের জন্য তিনি মহান আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন।

উপসংহারে আমীরে জামায়াত বলেন, 'সত্যিকার দেশ গড়ার জন্য আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম করা অপরিহার্য। জামায়াত এ উদ্দেশ্যেই সংগ্রাম করে যাচ্ছে।' জামায়াতের এ আন্দোলনের ঐতিহ্যকে আরো সমুন্নত করার আহ্বান জানিয়ে এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে তিনি তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্য শেষ করেন।"

সাংগঠনিক সফরের সিদ্ধান্ত

যথেষ্ট আলোচনার পর সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত হয় যে, রুকন ও কর্মীসম্মেলন এবং শিক্ষাশিবির উপলক্ষে বিভিন্ন জেলায় আমার সফরের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। তবে প্রকাশ্য ময়দানের কর্মীসম্মেলনেও অংশগ্রহণ করা যাবে না।

১৯৯০ সালে ফরিদপুর সফরে বাধা দিয়ে এরশাদ সরকার আমার সাংগঠনিক সফরের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জেলা প্রশাসনের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয় যে, কোথাও ঘরোয়া বৈঠকেও যেন আমাকে যেতে দেওয়া না হয়।

১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে এরশাদের পতনের পর বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের কেয়ারটেকার সরকার আমলে সারা দেশেই আমি ব্যাপকভাবে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলাম। ঐ অভিযানে সকাল থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত, কোনো কোনো দিন আট-দশটি জনসমাবেশে হাজির হতে হয়েছিল এবং এক দিনে দু-তিনটি জেলায়ও যেতে হয়েছিল।

১৯৯২ সালের জানুয়ারি থেকে ২৪ মার্চ গ্রেফতার হওয়া পর্যন্ত সময়েও কোনো সফর করা সম্ভব হয়নি। সে হিসেবে ১৯৯২ ও '৯৩ পূর্ণ দুটো বছর আমি সফর করিনি। এ দুই বছরের মধ্যে জেলেই ১৬ মাস কেটেছিল। ১৯৯৩-এর ডিসেম্বরে মজলিসে শূরায় সিদ্ধান্ত হওয়ার পর সাংগঠনিক সফর শুরু হয়।

মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশনে সমাপনী ভাষণ

উক্ত অধিবেশনে সমাপনী ভাষণে যেসব জরুরি কথা বলেছিলাম, এর কয়েকটি কার্যবিবরণী থেকে উল্লেখ করছি:

১. বিগত দুই বছরে ইসলামী আন্দোলনের দুশমনরা জামায়াতে ইসলামী ও আমার নাম জনগণের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছে। জনগণকে আমাদের বিরুদ্ধে খেপানোর উদ্দেশ্যে ঘাদানি কমিটি সারা দেশ সফর করে যে অপপ্রচার চালিয়েছে, তাতে জামায়াতের নাম এমন লোকদের কানেও পৌঁছেছে, যাদের কাছে আমরা আগে পৌঁছতে পারিনি। এখন আমাদের দায়িত্ব হলো জামায়াতের আসল পরিচয় সবার নিকট তুলে ধরা।

   আবু জাহল ও আবু লাহাবরা হজ্জের মৌসুমে মিনায় রাসূল (স)-এর বিরুদ্ধে জনগণকে সতর্ক করতে গিয়ে গোটা আরবে তাঁর নাম পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। তিনি যখন স্বয়ং গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন, তখন সবাই কৌতূহলী হয়ে তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছিল। এভাবে দুশমনদের অপপ্রচারও দাওয়াত পৌঁছানোর সহায়ক হতে পারে।

২. দায়িত্বশীলদেরকে নিয়মিত স্টাডি সার্কেল পরিচালনার পরামর্শ দেওয়া হয়, যাতে তাঁদের মান আরো উন্নত হয়।

৩. জেলা ও থানা পর্যায়ের জামায়াতের দায়িত্বশীলগণের প্রতি প্রশাসনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিকট ইসলামী আন্দোলনের সাহিত্য পৌঁছাতে পারলে তাঁরা জামায়াত সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেয়ে যাবেন।

৪. ইসলামী দলগুলোর নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা হলে জামায়াত সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর হয়ে যাবে।

৫. ইসলাম ও জামায়াতের পক্ষে জনমত গঠন করাই সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক কাজ। এ উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত দুটো কথা জনগণের নিকট ব্যাপকভাবে তুলে ধরতে হবে–

   ক. আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম করা ছাড়া জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন হতে পারে না। কুরআনের মতে, মানুষের মনগড়া আইন ও অসৎ লোকের শাসনই সকল অশান্তির কারণ।

   খ. সৎ লোক এমনি এমনি তৈরি হয়ে যায় না। যেসব দল সৎ ও চরিত্রবান লোক গড়ে তোলার চেষ্টা করে না, সেসব দলের হাতে ক্ষমতা তুলে দিলে অশান্তিই বাড়তে থাকবে।

সবশেষে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা, তাঁরই দরবারে ধরনা দেওয়া, তিনি ছাড়া অন্য কারো ভয়ে ভীত না হওয়া এবং একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।

নাগরিকত্ব মামলার প্রধান উকিল

আমার নাগরিকত্ব মামলার প্রধান উকিল ছিলেন ব্যারিস্টার এ আর ইউসুফ। তাঁর প্রধান সহকারী ছিলেন ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে শুনানি চলাকালে আদালতে যুক্তিগুলো যথাযথভাবে পেশ করার জন্য দুজনই সিরিয়াসলি প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। শুনানি শুরু হতে যতই বিলম্ব হচ্ছে ততই তাঁরা ইসলামী আন্দোলনের সবাইকে আল্লাহর দরবারে খাসভাবে দোআ করার তাকীদ দিতে থাকলেন।

ব্যারিস্টার ইউসুফ সাহেব আমাকে বললেন, 'জীবনে আমি কোনো মামলার ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য এত বেশি চাইনি। হাইকোর্টের শুনানিকালেও চেম্বারে বসে অনেকক্ষণ আল্লাহর দিকে গভীর মনোযোগ দিয়ে প্রাণভরে দোআ করার পর নথি দেখে যুক্তিগুলো যাচাই করেছি। প্রস্তুতির ব্যাপারে কখনো সামান্য অমনোযোগীও হইনি। তাই সবাইকে বেশি করে দোআ করতে বলেছি, যাতে প্রস্তুতিতে সামান্য ত্রুটিও না থাকে এবং আদালতে বক্তব্য পেশ করার সময় কোনো পয়েন্ট বাদ না পড়ে। আল্লাহর প্রতি তাঁর এ নির্ভরতা দেখে আমি তাঁর প্রতি গভীর ভালোবাসা বোধ করি।

শুনানি বিলম্বিত হচ্ছে দেখে ব্যারিস্টার ইউসুফ হজ্জে গিয়েছিলেন। তখন মক্কা শরীফে জামায়াতের প্রতিনিধি হিসেবে মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম দায়িত্ব পালন করছিলেন। হজ্জের সময় ব্যারিস্টার সাহেবকে সহযোগিতা করার জন্য তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়। শহীদুল ইসলাম বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম ডাইরেক্টর।

জামায়াতের পক্ষ থেকে মামলার তদারকি, উকিলদের সাথে যোগাযোগ ইত্যাদির দায়িত্ব জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের উপর ন্যস্ত ছিল। ব্যারিস্টার ইউসুফের সাথে মুজাহিদ সাহেবও হজ্জে গিয়েছিলেন।

মক্কায় কর্মরত শহীদুল ইসলাম থেকে জানা গেল, ব্যারিস্টার সাহেব ও মুজাহিদ সাহেব সব সময় একসাথেই ছিলেন। সৌদি আরবে কর্মরত সংগঠনভুক্ত যাঁরা ঐ বছর হজ্জ করেছিলেন তাঁরা মিনা, আরাফাত ও মুজদালিফায় ঐক্যবদ্ধভাবে মুজাহিদ সাহেবের নেতৃত্বে সকল অনুষ্ঠান পালন করেছেন। সর্বত্রই মামলায় যেন আল্লাহ তাআলা বিজয়ী করেন, সেজন্য কেঁদে কেঁদে দোআ করা হয়েছিল। ব্যারিস্টার সাহেব সবার কাছে খাসভাবে দোআ চেয়েছিলেন।

যতদিন তাঁরা মক্কা ও মদীনায় ছিলেন, ততদিনই মামলায় সাফল্যের জন্য অব্যাহতভাবে দোআ করেছিলেন। পৃথকভাবে তো সব সময়ই দোআ করেছেন, মাঝে মধ্যে দীনী ভাইদের নিয়ে সমবেতভাবেও দোআ করেছেন।

ব্যারিস্টার সাহেবের আল্লাহ তাআলার প্রতি নির্ভরতা দেখে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হই। যতবারই তিনি এ বিষয়ে কথা বলেছিলেন, ততবারই তাঁর আন্তরিকতা ও আবেগ লক্ষ করেছিলাম। উকিল হিসেবে একজন আল্লাহওয়ালাকে পেয়ে আমি অত্যন্ত উৎসাহবোধ করেছি।